পঞ্চদশ অধ্যায়

পরিবেশ ও উন্নয়ন

বিশ্বের আরো অনেক দেশের মত বাংলাদেশেও পরিবেশগত উন্নয়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। পরিবেশগত সমস্যা মোকাবেলা করে দূষণমুক্ত সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও পরিবেশবান্ধব প্রতিবেশ গড়ে তুলতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন নীতি এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তাই 'রূপকল্প- ২০২১' এ পরিবেশগত উন্নয়নকে অন্যতম লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) এর পরিবেশগত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নের কর্মকৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা ও অভিযোজন কর্মসূচি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে 'Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP), 2009' বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল গঠন করা হয়েছে। অর্থ বিভাগ 'Inclusive Budgeting and Financing for Climate Resilience (IBFCR)' শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড নীতিমালা', ও 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড আইন, ২০১০' প্রণয়নসহ উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় 'Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF)' গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, ওজোন স্তর রক্ষা এবং পরিবেশকে সার্বিকভাবে দূষণমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা ও বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জাতীয় জীব নিরাপত্তা কর্মকাঠামো বাস্তবায়ন এবং 'National Biodiversity Strategy and Action Plan' কে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং হালনাগাদ করা হয়েছে। পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি, নগরায়ণ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধিসহ নানা কারণে জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের অবক্ষয়ের ফলে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশেও প্রতিবেশ আজ হুমকির সম্মুখীন। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি দেশের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবেশগত এ সব সমস্যা সমাধানপূর্বক বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত একটি সুস্থ, সুন্দর, টেকসই, পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ, যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো উন্নয়নে সরকার কাজ করছে। সরকারের হয়ে এ ক্ষেত্রে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পরিবেশ সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ

১৯৭২ সালে সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত 'UN Conference of the Human Environment' হচ্ছে পরিবেশ বিষয়ক প্রথম উল্লেখযোগ্য বৈশ্বিক সম্মেলন। এর আওতায় বিভিন্ন দেশে পরিবেশ বিষয়ক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে এবং বহু দেশ পরিবেশগত নীতি ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ সম্মেলনের আওতায় জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিও অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলনকে বিশ্ব পরিবেশ সংরক্ষণের অন্যতম মাইলফলক বিবেচনা করা হয়। এ সম্মেলনে বৈশ্বিক পরিবেশ সুরক্ষায় তিনটি কনভেনশন (১) Convention on Biological Diversity (CBD); (২) United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) ও (৩) United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) গৃহীত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত হয় কিয়োটো প্রটোকল। ক্ষতিকর কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও গ্রীনহাউজ গ্যাস উদগীরণ কমানোর লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত কিয়োটো প্রটোকল মোট ১৯১টি (ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ) দেশ অনুসমর্থন করে।

শুরুতে কিয়োটো প্রটোকলের মেয়াদ ছিল ১৫ বছর (১৯৯৭-২০১২)। পরবর্তীতে এর কার্যকারিতার মেয়াদ আরো ৮ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে (২০১৩-২০২০)। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের জন্যে শিল্পোন্নত দেশগুলোই দায়ী। ইতোমধ্যে কানাডা কিয়োটো প্রটোকল থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এছাড়া, নিউজিল্যান্ড, রাশিয়া ও জাপান কিয়োটো প্রটোকলের দ্বিতীয় মেয়াদে অংশ নেয়নি। ফলশ্রুতিতে, বৈশ্বিক গ্রীনহাউজ গ্যাস

নিঃসরণে কিয়োটো প্রটোকলের অবদান আরো কমে আসবে। গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমণকারী বিশ্বের শীর্ষ ১০টি দেশের তালিকা সারণি ১৫.১ দেয়া হলোঃ

সারণি ১৫.১: বিশ্বের নির্বাচিত দেশসমূহের গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমনের বিবরণ

ক্র. নং	দেশ	বার্ষিক মোট গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমণ, ২০১২ (মিলিয়ন মেট্রিক টনস)	শতকরা নির্গমণ (%)
১	চীন	১১,৭৩৫.০১	২৫.৯৩
২	যুক্তরাষ্ট্র	৬২৭৯.৮৪	১৩.৮৭
৩	ভারত	২৯০৯.০৬	৬.৪৩
৪	রাশিয়া	২১৯৯.১২	৪.৮৬
৫	জাপান	১৩৫৩.৩৫	২.৯৯
৬	ব্রাজিল	১০১৭.৮৭	২.২৫
৭	জার্মানি	**৮৯৪.০৬**	১.৯৮
৮	ইন্দোনেশিয়া	**৭৪৪.৩৪**	১.৬৪
৯	কানাডা	৭৩৮.৩৮	১.৬৩
১০	মেক্সিকো	৭৩৩.০১	১.৬২

উৎসঃ পরিবেশ অধিদপ্তর। CAIT ClimateData Explorer.2017. Wasington, DC. World Resource Institute.

জলবায়ু সম্মেলন

UNFCCC এর সদস্য দলগুলো নিয়ে প্রতিবছর বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এটি UNFCCC দলগুলোর বার্ষিক সম্মেলন (annual Conference Of Parties- COP) নামে পরিচিত। সম্মেলনে মূলত UNFCCC এর বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। ২০১৭ সালের ০৬-১৭ নভেম্বর তারিখে জার্মানির বনে অনুষ্ঠিত হয় COP 23 সম্মেলন। সম্মেলনে ২০১৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত COP 21 সম্মেলনে গৃহীত প্যারিস জলবায়ু চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য নানাবিধ কার্যবিধি, প্রক্রিয়া এবং নির্দেশাবলী প্রণয়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এছাড়া, সম্মেলনে ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিতব্য Facilitative Dialogue অনুষ্ঠানের রূপরেখা 'Talanoa Dialogue' এর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। 'Talanoa Dialogue' এর মাধ্যমে প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের জন্যে সদস্য দেশসশূহ ও বিভিন্ন সংস্থার গৃহীত সকল কার্যক্রম, অগ্রগতি ও করণীয় পর্যালোচনা করা হবে।

পরিবেশ সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ, জলবায়ু সম্মেলন ও বাংলাদেশ

পরিবেশ রক্ষায় নেয়া নানা আন্তর্জাতিক উদ্যোগ, ধরিত্রী সম্মেলনসহ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সকল সম্মেলনে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছে। ১৯৯৭ সালে কিয়োটো প্রটোকল অনুমোদিত হওয়ার দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ তা স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে। তাছাড়া, বাংলাদেশ বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসেবে ২০১৩ সালে কিয়োটো প্রটোকলের দ্বিতীয় চুক্তি মেয়াদ (২০১৩-২০২০) অনুসমর্থন করে। ২০১৫ সালে COP 21 সম্মেলনে গৃহীত প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে বাংলাদেশ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের প্রথম দিনেই স্বাক্ষর করে। ২০১৭ সালে জার্মানির বনে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনে (COP 23) বাংলাদেশ অংশ নেয়। সম্মেলনে বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অত্যন্ত বিপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর স্বার্থ সংরক্ষণে বাংলাদেশ জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর একটি। জার্মানওয়াচ এর হিসাব অনুযায়ী দীর্ঘমেয়াদি জলবায়ু ঝুঁকি সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ষষ্ঠ। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে দেশের উপকূলবর্তী এলাকা সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। বিশ্বব্যাংক এর প্রতিবেদন 'Economics of Adaptation to Climate Change: Bangladesh' ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা মোকাবেলায় ২০৫০ সাল পর্যন্ত প্রতিবছরে গড়ে মোট ১৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অতিরিক্ত অর্থায়ন প্রয়োজন হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার 'National Adaptation Programme of Action (NAPA), 2005 প্রণয়ন করে। ২০০৯ সালে এতে কিছুটা সংশোধন আনয়ন করা হয়। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP), 2009' প্রণয়ন করা হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সর্বপ্রথম জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলায় এ ধরনের সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। 'BCCSAP'তে ৬টি বিষয়ভিত্তিক ৪৪টি কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। চিহ্নিত কার্যক্রমগুলোর বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল (BCCTF) গঠন করা হয়। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশই নিজস্ব অর্থায়নে এ ধরনের তহবিল গঠন করেছে। শুরু থেকে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত তহবিলে মোট ৩,২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। চলমান BCCSAP-এর মেয়াদ শেষ হবে ২০১৮ সালে। এ কারণে বর্তমানে নতুন BCCSAP প্রণয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

BCCSAP'র কাঠামোর আওতায় ২০১৬ সালে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত দেশীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি) প্রণীত হয়েছে। এটি একটি পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনায় পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন (ইএফসিসি) সেক্টরসমূহের অধীনে বিনিয়োগের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার পক্ষে UNFCCC-তে দাখিলকৃত কর্মকৌশল এবং লক্ষ্যমাত্রা সিআইপিতে উল্লেখ করা হয়েছে। দেশের টেকসই উন্নয়নে ইএফসিসি'র অবদান বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস, পরিবেশগত ও মানব স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন এবং জলবায়ু পরিবর্তনগত প্রভাব কাটিয়ে ওঠার সক্ষমতা বৃদ্ধি করাই সিআইপি'র মূল উদ্দেশ্য। এ বিনিয়োগ পরিকল্পনার মোট প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ১১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তন্মধ্যে নিজস্ব অর্থায়নের পরিমাণ ৪.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

দীর্ঘমেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সমন্বিতভাবে অভিযোজন কৌশল ও করণীয় নির্ধারণকল্পে UNFCCC এর আওতায় 'National Adaptation Plan (NAP)' প্রণয়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে একটি NAP Road Map প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ UNFCCC'র সক্রিয় সদস্য হিসাবে অভিযোজন ও প্রশমন খাতে বেশ কিছু কার্যক্রম চিহ্নিত করে 'Nationally Determined Contributions (NDC)' শীর্ষক একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় ১০ শতাংশ কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করার লক্ষ্যমাত্রাসহ বাংলাদেশ তার নিজস্ব সক্ষমতায় ৫ শতাংশ কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। NDC বাস্তবায়নের জন্য পূর্ণাঙ্গ 'NDC Implementation Road Map' এবং বিদ্যুৎ, শিল্প ও যানবাহনখাতে 'NDC Mitigation Action Plan' প্রণয়ন করা হচ্ছে।

এছাড়াও, 'Nationally Appropriate Mitigation Action (NAMA)' প্রণয়ন এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে 'Climate Change Unit' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অধিকন্তু, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সরকার বেশ কিছু কর্মসূচি/কার্যক্রম ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা, ২১০০' প্রণীত হয়েছে। টেকসই পানি, প্রতিবেশ, পরিবেশ ও ভূমি ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করে ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূর করে উচ্চ মধ্য আয়ের দেশে বাংলাদেশকে রূপান্তর করা এ পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ পরিকল্পনায় প্রতি বছর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চরম ঘটনাসমূহের সাম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ গড়ে জিডিপি'র ১.৬ থেকে ২ শতাংশ পর্যন্ত প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও অন্যান্য পরিবেশগত প্রভাব মোকাবেলায় প্রতিবছর জিডিপি'র অতিরিক্ত ১.৭ শতাংশ বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে বলে পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ অভিযোজন, প্রশমন, জলবায়ু অর্থায়ন, জলবায়ু প্রযুক্তি আহরণ ও হস্তান্তর এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতি ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও স্থানান্তর বিষয়ক বিভিন্ন বৈঠকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে।

অভ্যন্তরীণ জলবায়ু অর্থায়ন

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমন ও অভিযোজনের লক্ষ্যে জলবায়ু অর্থায়ন জোরদার করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত অনেক দেশের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। বাংলাদেশ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জলবায়ু অর্থায়নে ১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করে, যা ঐ বছরের বাজেটের ৬.৩৬ শতাংশ এবং জিডিপি'র ১.১৯ শতাংশ। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ৬টি মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু অর্থায়নের হিসাব সম্বলিত একটি প্রতিবেদন 'জলবায়ু সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে: বাজেট প্রতিবেদন ২০১৭-১৮' জাতীয় সংসদে পেশ করা হয়। এ প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ঐ মন্ত্রণালয়গুলোর মোট বরাদ্দের ১৯.২ শতাংশ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় বরাদ্দ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২০টি মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দে জলবায়ু অর্থায়ন নিরূপণপূর্বক একটি প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়ন

'Climate Public Expenditure and Institutional Review' ২০১২ (CPEIR-২০১২) অনুযায়ী বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নের এক চতুর্থাংশ এসেছে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন তহবিল যথাঃ 'Bangladesh Climate Change Resilient Fund (BCCRF)'; 'Least Development Country Fund (LDCF)' এবং 'Special Climate Change Fund (SCCF)' এর মাধ্যমে উন্নয়ন সহযোগীরা অর্থায়ন করে থাকে । এ সকল উৎস হতে এ পর্যন্ত প্রায় ৩২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার জলবায়ু অর্থায়ন হয়েছে।

সামনের দিনগুলোতে আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়নের একটি অন্যতম প্রধান উৎস হতে যাচ্ছে 'Green Climate Fund (GCF)'। ২০২০ সালের মধ্যে এ তহবিলে প্রতি

বছর ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদানের বিষয়ে উন্নত অর্থনীতির দেশগুলো সম্মত হয়েছে। GCF থেকে জলবায়ু অর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে 'National Designated Authority' সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে 'Infrastructure Development Company Limited (IDCOL)' ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) মাধ্যমে জলবায়ু অর্থায়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের (National Implementing Entity) স্বীকৃতি পেয়েছে। চলতি অর্থবছরে ৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বাংলাদেশের ২টি প্রকল্প GCF অনুমোদন করেছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ও বাংলাদেশ

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট **(২০১৬-২০৩০)** এর অন্যান্য অভীষ্টের ন্যায় পরিবেশ ও জলবায়ু সংক্রান্ত অভীষ্টগুলো বাস্তবায়নেও সরকার কাজ করছে। এসডিজি'র ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ৩টি অভীষ্ট সরাসরি পরিবেশ ও জলবায়ুর সাথে সম্পৃক্ত। ১৩ নাম্বার অভীষ্টে 'জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কার্যক্রম গ্রহণ এর কথা বলা হয়েছে। এ অভীষ্টের প্রথম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় দুর্যোগকালে প্রতি ১ লক্ষ জনগণের মধ্যে মৃত্যু, নিখোঁজ ও সরাসরি দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে ১,৫০০ জনে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৪ সালের তথ্য অনুযায়ী এ সংখ্যা ১২,৮৮১ জন। ১৪ নাম্বার অভীষ্টে 'টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার' এর বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এ অভীষ্টের অন্যতম একটি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে মোট সামুদ্রিক এলাকার ২.৫ শতাংশ সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করতে চায়। মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে সামুদ্রিক এলাকার কোন অংশই সংরক্ষিত নয়। এসিডিজি'র ১৫ নাম্বার অভীষ্ট হচ্ছে 'স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারের পৃষ্ঠপোষণ, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়া মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ'। এ অভীষ্টের প্রথম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে মোট ভূমির ২০ শতাংশ বনভূমি স্থাপন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। বর্তমানে দেশের মোট ভূমির ১৩.২৩ শতাংশ বনভূমি রয়েছে।

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত কার্যক্রম

ক্রমবর্ধমান নগরায়ণের ফলে অবকাঠামো নির্মাণ এবং যানবাহন ও কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এ সকল উৎস থেকে সৃষ্ট বায়ুদূষণও ক্রমশ বাড়ছে। মানবস্বাস্থ্যের উপর বায়ুদূষণের বিরূপ প্রভাবসহ অন্যান্য ক্ষতিকর প্রভাব নিরসনের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর উন্নত প্রযুক্তির ইটভাটার প্রচলন, যানবাহন ও কলকারখানা সৃষ্ট ক্ষতিকর ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বায়ুদূষণ জনিত পরিবেশগত সমস্যা নিরসনে সরকার নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে:

বায়ুদূষণ পরিবীক্ষণ

- দেশের বড় শহরগুলোতে বায়ুদূষণ সমস্যা প্রকট। সরকার বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় 'নির্মল বায়ু এবং টেকসই পরিবেশ' (Clean Air and Sustainable Environment (CASE)' প্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রকল্পের আওতায় ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য বিভাগীয় ও শিল্পঘন শহরগুলোতে সার্বক্ষণিক বায়ু পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রকল্পের অধীন বায়ুদূষণ পরিবীক্ষণ, বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ, গবেষণা এবং এতৎসংক্রান্ত বিষয়ের অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরের বায়ুদূষণ মাত্রা পরিমাপ করার জন্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট ও বরিশালসহ সারাদেশে মোট ১১টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন চালু করা হয়েছে।
- এ সকল স্টেশনের মাধ্যমে ঐ শহরগুলোতে বায়ুদূষণের উপাদানসমূহের (বস্তুকণা, ওজোন, সালফার ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড ইত্যাদি) পরিমাণ সার্বক্ষণিকভাবে পরিমাপ করা হচ্ছে।

যানবাহন হতে সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ

- যানবাহনের ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টির জন্য 'বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধন ২০১০)' অনুসারে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মাধ্যমে জরিমানা আদায় করা যায়। এছাড়া 'মোটরযান আইন, ১৯৮৩' এর আওতায় পুলিশ জরিমানা আদায় করতে পারে। ডিজেল চালিত পুরাতন মোটরযান বস্তুকণা নিঃসরণের আরেকটি প্রধান উৎস। যানবাহন সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে ঢাকা-চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন শহরে

গাড়ির ধোঁয়া পরিবীক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করছে এবং অধিক দূষণ সৃষ্টিকারী গাড়ির বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

ইট ভাটা সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের সাথে সাথে নির্মাণশিল্পের ব্যাপকতার কারণে দেশে ইটের চাহিদাও বাড়ছে। ফলে যততত্র ইটের ভাটা গড়ে উঠেছে। এ সকল উৎস থেকে সৃষ্ট বায়ুদূষণও ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইটভাটা থেকে দূষণ কমানোর লক্ষ্যে পুরাতন পদ্ধতির ইট ভাটার পরিবর্তে জ্বালানি সাশ্রয়ী বায়ুদূষণ রোধে কার্যকর ও আধুনিক প্রযুক্তির পরিবেশবান্ধব ইটভাটা স্থাপনে কাজ করছে পরিবেশ অধিদপ্তর। ইট নির্মাণশিল্পকে পরিবেশ সম্মতভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে 'ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে।

পুরাতন পদ্ধতির সকল ইটভাটাকে জুন, ২০১৪ সাল থেকে পরিবেশবান্ধব আধুনিক প্রযুক্তিতে রূপান্তরের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বর্তমানে দেশে ৪,৪০৭টি ইটভাটা আধুনিক প্রযুক্তিতে পরিচালিত হচ্ছে যা দেশে বিদ্যমান ইটভাটার ৬৫ শতাংশ।

শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ

পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান বিষয়ক কার্যক্রম

শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবেশ দূষণের মাত্রা সহনীয় ও গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে রাখতে প্রয়োজনীয় ও প্রযোজ্য ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে 'বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০)' এবং 'পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭' অনুসরণ করা হয়। দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার ব্যবস্থা, শব্দ প্রতিবন্ধক ব্যবস্থা, বায়ু পরিশোধন ব্যবস্থা স্থাপনসহ সকল প্রকার প্রশমন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হবে শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। নিজস্ব লোকবল ও যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে অভ্যন্তরীণ পরিবেশগত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার শর্তও ছাড়পত্রে জুড়ে দেয়া হয়। এছাড়া সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse and Recycle) নীতি ও সকল প্রকার সম্পদ সংরক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বহুতল আবাসিক ভবনসমূহে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা স্থাপনের শর্তসাপেক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়নের ক্ষেত্রে শর্তারোপ করা হচ্ছে।

শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম

- **ইটিপি (ETP) স্থাপন:** পানি দূষণ রোধে তরল বর্জ্য নির্গমনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা (ETP – Effluent Treatment Plant) স্থাপনে পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবীক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখছে। ফলে অধিকাংশ পানি দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যে ইটিপি নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ১,৬৩৪টি কারখানায় ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে। একই সময়ে ২৭০টি কারখানার তিন বছর মেয়াদি জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদন করা হয়েছে।

- **এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম:** 'বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন' এর অধীনে পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ আদালতে মামলা দায়ের, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। পরিবেশ দূষণের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ১৮৮টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এসব অভিযানে ১০.৪৫ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ আরোপপূর্বক ৫.৫৭ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে।

- **নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগের বিরুদ্ধে অভিযানঃ** নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ বন্ধে সারাদেশে ৮টি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। টাস্কফোর্সসমূহ নিয়মিত নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তর পরিচালিত অভিযানের মাধ্যমে ৫৪ টন নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ জব্দ করা হয়। একই সময়ে ২৯.৪২ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

- পরিবেশ অধিদপ্তর শব্দদূষণ রোধ ও শব্দদূষণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'Survey of Noise Level in Seven Divisional Headquarters Under the Integrated and Participatory Programme to Control Noise Pollution' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

- **বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমঃ** গৃহস্থালী বর্জ্য কর্তৃক দুর্গন্ধ ছড়ানো ও গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন সমস্যা নিরসণপূর্বক পরিবেশসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে শহরের জৈব আবর্জনা ব্যবহার করে প্রোগ্রাম্যাটিক সিডিএম শীর্ষক পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন

করা হচ্ছে। প্রকল্পের অধীনে নারায়ণগঞ্জ ও রংপুর সিটি কর্পোরেশন এবং ময়মনসিংহ ও কক্সবাজার পৌরসভায় ইতোমধ্যে কম্পোস্ট প্লান্ট নির্মিত হয়েছে। প্লান্টে শহরের জৈব আবর্জনা এ্যারোবিক পদ্ধতিতে কম্পোস্ট সারে রূপান্তর করা হয়। প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্বের আওতায় কিশোরগঞ্জ ও ফেনী পৌরসভায় আরো দুটি কম্পোস্ট প্লান্ট নির্মাণ করা হবে।

পানি ও পরিবেশ

বাংলাদেশের উপর দিয়ে বহমান নদীগুলো ও জলাশয় দেশের বাস্তুসংস্থান পদ্ধতিকে সচল ও উৎপাদনমুখী রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এসব নদী ও জলাভূমি বিভিন্ন রকম জলজীবের আবাসস্থল।

'বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা-১৯৯৭' অনুযায়ী দেশের প্রধান প্রধান নদীর (পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ধলেশ্বরী, সুরমা ও কুশিয়ারা) পানির গুণগত মান সারা বছরই গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে থাকে। কিন্তু ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর (বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও বালু নদী) পানির গুণগত মান সীমার বাইরে চলে যায়। বিশেষত শুষ্ক মৌসুমে যখন নদীর পানি প্রবাহ খুব কম থাকে তখন কোন কোন স্থানের পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ শূন্য হয়ে যায় যা জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলের বেঁচে থাকার জন্যে উপযুক্ত নয়। এ নদীগুলোর প্রতিবেশগত অবস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও বালু নদীর 'ফোরশোর' এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করছে। পরিবেশ অধিদপ্তর ১৯৭৩ সাল থেকে নদীর পানির মান পরিবীক্ষণ করছে। দেশের ৬৩টি স্থানে ২৭টি নদীর পানি পরিবীক্ষণ করা হয়। পরিবীক্ষণ স্থিতিমাপকগুলো হলোঃ pH, Chloride, Turbidity, Total Dissolved Solid (TDS), Dissolved Oxygen (DO), Biochemical Oxygen Demand (BOD) and Chemical Oxygen Demand (COD)।

উল্লিখিত স্থিতিমাপক অনুসারে পরিবীক্ষণ ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ২০১৬ সালে বাংলাদেশের বড় বড় নদীগুলোর (পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, করতোয়া, ধলেশ্বরী, সুরমা ইত্যাদি) পানির গুণগত মান পরিবেশগত মানমাত্রার মধ্যে ছিল। DO, BOD এবং COD এর মানের ভিত্তিতে দেখা যায় বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা এবং তুরাগ নদী শুষ্ক মৌসুমের চার/পাঁচ মাস খুব দূষিত থাকে। এসব নদীর বিভিন্ন স্থানে জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত দ্রবীভূত অক্সিজেন প্রায় শূন্য থাকে। ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বুড়িগঙ্গা নদীতে উচ্চ মাত্রার BOD ৫০.২০ মি:গ্রা:/লি: (পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা অনুসারে গ্রহণযোগ্য মান ৬ মি:গ্রা:/লি: বা তার নিম্নে), COD ২১২.৬২ মি:গ্রি:/লি: (UNECE মান অনুসারে গ্রহণযোগ্য মান ৩৫ মি:গ্রা:/লি: বা তার নিম্নে). Chloride ৫৬.৯৮ মি:গ্রা:/লি: (USEPA মান অনুসারে গ্রহণযোগ্য মান ২৫০ মি:গ্রা:/লি:) এবং TDS ৬৪১ মি:গ্রা:/লি: (USEPA মান অনুসারে গ্রহণযোগ্য মান ৫০০ মি:গ্রা:/লি:) পাওয়া যায়।

২০১৬ সালে ময়ূরী, রূপসা, পশুর ও খেকশিয়ালী নদীতে উচ্চ মাত্রায় Chloride, TDS, Turbidity পাওয়া গিয়েছে। পশুর নদীতে সর্বোচ্চ Chloride ৭,২২৮ মি:গ্রা:/লি (USEPA মান অনুসারে গ্রহণযোগ্য মান ২৫০ মি:গ্রা:/লি) TDS ১১,৫২১ মি:গ্রা:/লি (USEPA মান অনুসারে গ্রহণযোগ্য মান ৫০০ মি:গ্রা:/লি) পাওয়া গিয়েছে। সাধারণত দক্ষিণাঞ্চলে প্রবাহিত নদীতে বেশি Turbidity লক্ষ্য করা যায়। উচ্চ Turbidity'র পানির স্বচ্ছতা হ্রাস পায়। ফলে একদিকে পানিতে ফাইটোপ্লাংকটনের উৎপাদন হ্রাস পায়, অন্যদিকে নদীর তলদেশে পলি জমে। খেকশিয়ালী নদীতে সর্বোচ্চ Turbidity ১২৪.৪৬ NTU (গ্রহণযোগ্য মান ১০ NTU পর্যন্ত) পাওয়া গিয়েছে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

জলবায়ু ও ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ জীব বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ একটি দেশ। ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ, শিল্পায়ন ও মানুষের অবিবেচক কর্মকাণ্ডের ফলে বাংলাদেশের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য আজ হুমকীর সম্মুখীন। এ কারণে সংবিধানে পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে।

ইতোমধ্যে 'বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭' প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় 'প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬' প্রণীত হয়েছে।

ন্যাশনাল বায়োডাইভারসিটি স্ট্রাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্লান

জীববৈচিত্র্য সনদ বা কনভেনশন অন বায়োলোজিক্যাল ডাইভারসিটি (সিবিডি)-এর অংশীদার হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের অঙ্গীকার পরিপূরণে পরিবেশ অধিদপ্তর কাজ করছে। জাতিসংঘ ঘোষিত 'জীববৈচিত্র্য কৌশলগত পরিকল্পনা, ২০১১-২০২০' এর আলোকে জাতীয় পর্যায়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের লক্ষ্যে 'National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP), 2016-2021' প্রণয়ন করা হয়েছে।

এ কর্মপরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো:

- **প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণ (**Ecologically Critical Area-ECA): 'প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬' জারি করা হয়েছে। এ পর্যন্ত দেশের ১৩টি এলাকাকে প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা (ECA) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলার বাদনাতলী ইউনিয়ন থেকে উৎপত্তি হয়ে কর্ণফুলী মোহনাতে শেষ হওয়া হালদা নদীকে প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা (ECA) ঘোষণা করা করা হয়েছে। পাশাপাশি, দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র হালদা নদী সংরক্ষণের কাজ চলছে।
    - **গ্রাম সংরক্ষণ দল গঠনঃ** প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষিত হাকালুকি হাওর, কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত ও সোনাদিয়া দ্বীপে স্থানীয় জনগণকে সংগঠিত করে সর্বমোট ৬৯টি গ্রাম সংরক্ষণ দল (Village Conservation Group) গঠন করা হয়েছে। দলগুলোর সদস্যদের মাধ্যমে পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। গ্রাম সংরক্ষণ দলের দপ্তর এবং পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রমসহ এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের লক্ষ্যে মোট ১০টি প্রতিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিটি প্রতিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্রে একটি জীববৈচিত্র্য জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ৪টি পরিবেশ টাওয়ার বা ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ করা হয়েছে।
    - **ম্যানগ্রোভ বন সৃজন ও সংরক্ষণঃ** কক্সবাজার জেলায় ম্যানগ্রোভ বন (প্যারাবন) সৃজন ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।
    - **জলজ বন সৃজন ও সংরক্ষণঃ** হাকালুকি হাওরে ৫০০ হেক্টর জলজ বন সংরক্ষণ এবং ১০ হেক্টর জলজ বন সৃজনের মাধ্যমে হাওরের প্রতিবেশ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়েছে। এই বন মাছসহ বিভিন্ন জলজ প্রাণীর নার্সারি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্ষা মৌসুমে জলজ প্রাণীর আবাস্থল ও শুষ্ক মৌসুমে বন্যপ্রাণী এবং স্থানীয় ও পরিযায়ী পাখির নিরাপদ আবাস।
    - **বিল-খাল পুনঃখননের মাধ্যমে জলাভূমির অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠাঃ** হাকালুকি হাওরে বিল-খাল পুনঃখননের মাধ্যমে প্রতিবেশ ব্যবস্থা ও মৎস্য সম্পদসহ জলজ সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ১০টি জলাভূমিতে অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
    - **সাবমার্জিবল বাঁধ নির্মাণ ও বাঁধ বরাবর সবুজবেষ্টনী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গাছের চারা রোপণঃ** প্রবল ঢেউয়ের আঘাত থেকে হাওর এলাকার বসতবাড়ি ও সম্পদ রক্ষার জন্য হাকালুকি হাওরে ১০টি সাবমার্জিবল বাঁধ নির্মাণ ও বাঁধ বরাবর সবুজবেষ্টনী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে।

ওজোন স্তর সংরক্ষণ

বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষর করে। এই প্রটোকলের পরবর্তী সংশোধনীগুলোও অনুমোদন করে। সরকার ১৯৯৫ সালে ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রী সংক্রান্ত জাতীয় কারিগরি কমিটি গঠন করে। ১৯৯৬ সালে 'ওজোন সেল' গঠন করা হয়েছে। এ সেল মন্ট্রিল প্রটোকল মাল্টিলেটারেল ফান্ডের আর্থিক সহায়তায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সরকার ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ করেছে। এছাড়া ওজোন স্তর রক্ষায় বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ সংশ্লিষ্টদের নানা ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তর 'ওজোন স্তর রক্ষা বৈশ্বিক ও জাতীয় উদ্যোগ শীর্ষক' বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় পুস্তিকা প্রকাশ করেছে।

পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং

বাংলাদেশ ব্যাংক জানুয়ারি ২০১১ সালে সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা জারি করে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের (ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সর্বমোট ৩১,৩২৮ কোটি টাকা পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন করেছে, তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের পরিমাণ ২,১৭২ কোটি টাকা। উল্লিখিত সময়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ৪৫,৫৬৫টি রেটিংকৃত প্রকল্পের মধ্যে ৩৬,০৭৬টি প্রকল্পে মোট ২,১৯,৯১৯ কোটি টাকা অর্থায়ন করেছে। সৌর শক্তি বায়োগ্যাস প্লান্ট এ্যাফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এর মতো পরিবেশবান্ধব পণ্য/খাতের অর্থায়নের পথ সুগম করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নিজস্ব তহবিল হতে ২০০৯ সালে পরিবেশবান্ধব পণ্য/খাতের জন্য ২০০ কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম তৈরি করে। বর্তমানে এটি পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগ এর জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম নামে পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে স্কিমের আওতায় কারখানার কর্ম পরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্যে ১১.০৩ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে।

ইট ভাটার চুল্লীর দক্ষতা উন্নয়ন করে কার্বন নির্গমন হ্রাস এবং জ্বালানির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ ব্যাংক 'Financing Brick Kiln Efficiency Improvement Project' প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে। এর আওতায় চলতি

অর্থবছরে ৬টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৯টি উপ-প্রকল্পে ১৩৮.৭৬ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

বন সংরক্ষণ

বন সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা বন অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমাণ ২.৩২ মিলিয়ন হেক্টর। এর মধ্যে ১.৬০ মিলিয়ন হেক্টর বন অধিদপ্তরের আওতাধীন। অবশিষ্ট ০.৭২ হেক্টর জেলা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন। অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত বনভূমির মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট ১.৪০ মিলিয়ন হেক্টর এবং অবশিষ্ট প্রায় ০.২০ মিলিয়ন হেক্টর উপকূলীয় অঞ্চলে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট। এছাড়াও দেশের সর্বত্র প্রায় ০.৭৭ মিলিয়ন হেক্টর বসতবাড়ি এবং প্রান্তিক পতিত ভূমি বৃক্ষাচ্ছাদনে আবৃত। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সহযোগিতায় অংশীদারিত্ব ভিত্তিক বন ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া প্রবর্তনের মাধ্যমে বর্তমানে বন ব্যবস্থাপনার প্রভূত উন্নয়ন ঘটেছে। দেশে বৃক্ষাচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বন মহাপরিকল্পনা ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০৩৫ সালের মধ্যে দেশের ২০ শতাংশ ভূমি বনাচ্ছদনের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সারণি ১৫.২ এ সার্ক দেশসমূহের বনভূমির পরিমাণের তুলনামূলক চিত্র দেয়া হলোঃ

সারণি ১৫.২ঃ সার্ক দেশসমূহের বনভূমির পরিমাণের তুলনামূলক চিত্র/পরিসংখ্যান

ক্রঃ নং	দেশের নাম	মোট ভূমির পরিমাণ (হাজার হেক্টর)	মোট বনভূমির পরিমাণ (হাজার হেক্টর)	বনভূমি কভারেজ (%)
১.	আফগানিস্তান	৬৫২২৩	১৩৬৯	২.০১
২.	বাংলাদেশ	১৪৭৫৭	১৯৫২.২২	১৩.২৩
৩.	ভূটান	৩৮৩৯	৩২৯৪	৮৫.৮০
৪.	ভারত	২৯৭৩১৯	৬৮৬৯০	২৩.১০
৫.	পাকিস্তান	৭৭০৮৮	১৬২০	২.১০
৬.	মালদ্বীপ	৩০	.৯০	৩.০০
৭.	নেপাল	১৪৩০০	৩৬৩৩	২৫.৪০
৮.	শ্রীলংকা	৬২৭১	১৮১৩.৪	২৯.২০

উৎসঃ বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর।

http://data.worldbank.org.indicator/AG.LND.FRST.ZS

দেশের বনজ সম্পদের ঘাটতি পূরণ, কাঠভিত্তিক শিল্প কারখানার কাঁচামাল সরবরাহ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বন অধিদপ্তর কাজ করছে। এছাড়া, পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং জনগণের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা জোরদার করতে বন অধিদপ্তর ইতোমধ্যেই বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বন অধিদপ্তরের অধীনে ১৯টি প্রকল্প চলমান আছে। এর মধ্যে ১২টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ৭টি কারিগরি প্রকল্প। এছাড়া, আরো ৬টি প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে। অধিকন্তু, চলতি অর্থবছরে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় ১৩টি উন্নয়ন প্রকল্প বন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সামাজিক বনায়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত কার্যক্রম

সামাজিক বনায়ন গ্রামীণ জনপদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। পাশাপশি, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা,জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত প্রশমন ও অভিযোজন এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণেও সামাজিক বনায়ন গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিনিয়োগ প্রকল্প এবং কর্মসূচির আওতায় ৪,৫৯১ হেক্টর ব্লক বাগান, ১,২০০ কিঃমিঃ স্ট্রিপ বাগান সৃজন করা হয়েছে। এছাড়া, ৩০.৩০ লক্ষ চারা বিতরণ করা হয়েছে।

'সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪' সংশোধন করে উপকারভোগীদের লভ্যাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং সরকারি বনে উপকারভোগীদের বিনিয়োগের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির সাথে ৬ লক্ষাধিক উপকারভোগীকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এ কার্যক্রমটি সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মহিলাদেরকে স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভর হতে সহায়ক ভূমিকা পালনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও নারীর ক্ষমতায়নে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি ব্যাপক অবদান রাখছে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম দেশের উদ্ভিদ সম্পদের উপর ট্যাক্সোনমিক গবেষণায় নিয়োজিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে মাঠ সমীক্ষার মাধ্যমে কৃষিজ, বনজ, ভেষজ, ক্ষয়িষ্ণু ও বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদসহ সকল প্রকার বৃক্ষলতা প্রজাতির নমুনা সংগ্রহ, সনাক্তকরণ ও সংরক্ষণ। সংগৃহীত উদ্ভিদ সম্পদের ডাটাবেজ প্রস্তুত করাও ন্যাশনাল হারবেরিয়ায়ের অন্যতম প্রধান কার্যক্রম। ন্যাশনাল হারবেরিয়াম দেশের উদ্ভিদ সম্পদের তথ্য সম্বলিত পুস্তিকা 'ফ্লোরা অব বাংলাদেশ'

নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ভেষজ সম্পদ, উদ্ভিদবিদ্যার চর্চা এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য বৃক্ষসম্পদের গবেষণা ও উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে হারবেরিয়াম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ একটি দেশ। ১৯৭০ ও ১৯৯১ সালের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়, ২০০৭ সালের সিডর, ২০০৯ সালের আইলা এবং ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪ ও ২০০৭ সালের ভয়াবহ বন্যার মত দুর্যোগ এ দেশের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। এছাড়া, প্রতি বছরই কোন না কোন দুর্যোগ আমাদের হানা দিচ্ছে। ২০১৭ সালে আগাম বন্যায় ৬টি জেলার হাওরের ফসল তলিয়ে গেলে চরম দুদর্শাগ্রস্ত হয়ে পড়ে হাওর পাড়ের মানুষেরা। তাছাড়া, দেশের উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চলের ৩৫টি জেলা বন্যা কবলিত হলে সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে কঠিনতম প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ। জনগণের দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সরকারের হয়ে কাজ করছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সার্বিক সক্ষমতা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে জনগণ বিশেষত দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রাস এবং বড় মাত্রার দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম একটি জরুরি সাড়া প্রদান পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করাই মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য। এর ফলে বাংলাদেশকে একটি দুর্যোগ সহনশীল দেশ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সাম্প্রতিক সময়ে গৃহীত পদক্ষেপ/ব্যবস্থা

(ক) আইন,নীতি,বিধি ও চুক্তি সংক্রান্ত পদক্ষেপ/ব্যবস্থা

- দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীতে বজ্রপাত ও ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অন্তর্ভুক্ত করে সংশোধন করা হয়েছে;
- 'দুর্যোগ পরবর্তী মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৬' প্রকাশ করা হয়েছে।
- 'দুর্যোগ পরবর্তী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা' চূড়ান্ত করা হয়েছে।

(খ) পরিকল্পনা প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ/ব্যবস্থা

- কার্যকর দুর্যোগ মোকাবেলার লক্ষ্যে বাংলাদেশে 'Incident Management System (IMS)' সংক্রান্ত গাইডলাইন প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া ভূমিকম্প পরবর্তী ধ্বংসাবশেষ অপসারণের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট নগরীর জন্য পৃথক 'Debris Management Plan' এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।

(গ) চলমান উন্নয়ন প্রকল্প

- ছোট ছোট সেতু/কালভার্ট নির্মাণঃ গ্রামীণ রাস্তায় জলাবদ্ধতা দূর করা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। জানুয়ারি ২০১৬ থেকে জুন ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের অধীনে মোট ১২,৯৯৩টি সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা হবে। মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত মোট ১০,৪৫০টি সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।
- গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহের টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) প্রকল্প: মূলত কাবিখা ও টিআর প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ কাঁচা সড়ক নির্মাণ করা হয়ে থাকে। ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচির আওতায়ও গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে। এসব কর্মসূচির মাধ্যমে এ পর্যন্ত প্রায় ৩ লক্ষ কিঃমিঃ মাটির রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু বর্ষা মৌসুমে রাস্তাগুলো নষ্ট হয়ে যায়। ফলে প্রতি বছর রাস্তাগুলো রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়। এমন পরিস্থিতিতে রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ব্যয় কমানোর জন্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) প্রকল্পটি নেয়া হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৩,১৪৫.৫০ কিঃমিঃ রাস্তা এইচবিবি করা হবে।
- দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প: প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষত ঘূর্ণিঝড় ঝুঁকিতে অবস্থিত অবকাঠামোসমূহের পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে সরকারের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে উন্নত করতে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের অধীনে অত্যধিক ঝুঁকিপ্রবণ ১২টি জেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন ও ৩৫টি উপজেলায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে আধুনিকায়ন করা হবে।